প্রিয় বাবা ক্যাম্পেইনঃ মেন কেয়ার বাংলাদেশ
“দায়িত্বশীল পিতা, সুখী পরিবার, সমৃদ্ধ দেশ”

প্রিয় বাবাদের গল্প

CMMS

MenCare
A GLOBAL FATHERHOO CAMPAIGN

UBS

PROMUNDO

প্রারম্ভিকা

সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, পারিবারিক বা গৃহস্থালি তত্ত্বাবধানে পুরুষ নারীর পাশাপাশি অংশগ্রহণ করলে নারীর উপর সামাজিক নানাবিধ প্রথা ও নিয়মকানুনের ফলে সৃষ্ট সহিংসতা কমে এবং নারী ও শিশু উভয়ের উপর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, দীর্ঘস্থায়ী ও ইতিবাচক প্রভাব পরে। ২০১১-১২ সালে ইউএনএফপিএ, বাংলাদেশের আর্থিক সহযোগিতায় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক (যারা সিএমএমএস প্রতিষ্ঠা করেন) বাবাদের নিয়ে একটি ফলিত গবেষণা পরিচালনা করেন। এই গবেষনার ফলাফলের প্রেক্ষিতে এবং **Promundo-US** এর বাবাদের নিয়ে **MenCare** শিরোনামের একটি বৈশ্বিক কার্য্যক্রমের অংশ হিসেবে **CMMS** বাংলাদেশে **MenCare Bangladesh: Engaging Fathers for Child and Family Well-Being and Gender Transformation** শিরোনামে বাবাদের তথা পুরুষদের সাথে নিয়ে সংক্ষেপে 'প্রিয়বাবা প্রকল্প' নামে একটি ফলিত গবেষণা বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথমধাপে চেষ্টা করা হয়েছে পিতৃত্বের সেসব প্রথাগত চর্চাগুলোর কারন খুঁজে বের করার যেগুলো আধিপত্যবাদী পৌরুষের **(Hegemonic Masculinity)** প্রভাবে নারী ও শিশুর উপর নানাপ্রকার সহিংসতা উসকে দেয় যা কিনা আবার পিতৃতন্ত্রের পুনরুৎপাদন নিশ্চিত করে। দ্বিতীয়ধাপে গবেষনা এলাকা থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে সেসব অনুকরনীয় বাবাদের **(Role Model Father)** যারা পিতৃত্বের প্রথাগত এ চর্চাগুলো করেননি বরং এমন উদ্যোগ নিয়েছেন যা নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়িত হতে সাহায্য করেছে। তৃতীয় ধাপে, একটি বিশেষভাবে রচিত ম্যানুয়াল অনুসরন করে ০-৫ বছর বয়সী সন্তান রয়েছে এমন বাবাদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে উঠোন বৈঠকের। এ উঠোন বৈঠকগুলোতে অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়েছে দ্বিতীয়ধাপে খুঁজে বের করা অনুকরনিয় বাবাদের **(Role Model Father)**। নতুন বাবারা এই বাবাদের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। এ আলোচনাগুলোতে উঠে এসেছে আধিপত্যবাদী পৌরুষের দ্বারা (আপাত-ঃদৃষ্টিতে) অবশ্যঅনুকরনীয় পিতৃত্বের প্রথাগত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে অনুকরনীয় বাবারা **(Role Model Father)** তাদের লাভ -ক্ষতির খতিয়ান। যেহেতু পিতৃত্বের প্রথাগত চর্চার বাইরে যেয়ে এই বাবারা লাভবান হয়েছেন কেননা তাদের সন্তানেরা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, সেহেতু এ উদ্যোগের ফলে আশা করা হয়েছে যে নতুন বাবারা তাদের সন্তান লালন পালনে পিতৃত্ব চর্চার সকল প্রকার ক্ষতিকর প্রথাকে চ্যালেঞ্জ করতে উদ্বুদ্ধ হবেন। ফলিত গবেষনাটির শেষধাপে গবেষণা নির্ভর বিস্তারিত অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে এই নতুন বাবাদের নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়িত করে এমন পিতৃত্ব চর্চায় অনুকরণীয় বাবারা **(Role Model Fathers)** উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে প্রেরণা যুগিয়েছেন। এই পুস্তিকাটিতে আমরা আটজন অনুকরনীয় বাবার জীবন কাহিনী **(Role Model Fathers)** খুবই সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছি। আশা রাখি এ গল্প আরো অনেক বাবাদের আগামীতে ভিন্নধারার পিতৃত্ব চর্চায় প্রেরণা যোগাবে। আর একসময় যখন সব বাবারাই এ চর্চাগুলো করবেন তখন পিতৃত্বের প্রথাগত চর্চা যা আধিপত্যবাদী পৌরুষকে সুসংহত করার মধ্যদিয়ে পিতৃতন্ত্রের পুনরুৎপাদন করে সে চর্চাগুলোই নির্মূল হয়ে যাবে।

সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজ, পিএইচডি (আমস্টারডাম)
সভাপতি, সি এম এম এস

“ধর্মের সাথে নারী শিক্ষার কোন বিরোধ নেই। প্রয়োজনে মেয়েরা চীন দেশে যাবে শিক্ষা অর্জন করতে”

- মোঃ হাফেজ গোলাম রাব্বানী

রংপুর

ধর্মীয় গোড়ামী সবসময়ই পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, পুনরুৎপাদনের হাতিয়ার। আধিপত্যবাদী পৌরুষ বাবাদের সেইসব ভূমিকাকে উৎসাহিত করে যেগুলো নারীর শিক্ষার সুযোগ বন্ধ করে দেয়। তবে বাংলাদেশে এমন বাবাও আছেন যাঁরা শুধু নিজের মেয়েদেরই নয় বরং স্ত্রীকেও সকল বাঁধার বিপক্ষে যেয়ে শিক্ষার আলো গ্রহনের সুযোগ করে দিয়েছেন। হাফেজ গোলাম রব্বানী এমনই একজন বাবা। রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া ইউনিয়নের বংশীগঞ্জ গ্রামে হাফেজ গোলাম রাব্বানীর জন্ম। ছোটবেলা থেকেই ইসলামিক আদর্শের মধ্য দিয়ে নিজেকে পরিচালিত করেছেন তিনি। বাংলা শিক্ষার পাশাপাশি তিনি আরবী শিক্ষা সমাপ্ত করে এখন সমাজে কুরআনে হাফেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর বাবা ছিলেন মক্তবের শিক্ষক। এ সমাজে নারী শিক্ষার তেমন প্রচলন না থাকলেও তাঁর মা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। হাফেজ গোলাম রাব্বানী একজন ধর্মবেত্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্ত্রী-সন্তানকে শিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখেননি। তিনি নারী শিক্ষাকে মনে-প্রাণে সমর্থন করেন। তাঁর মতে একজন পুরুষ যেমন সংসারের হাল ধরতে পারেন, তেমনি একজন নারীও প্রয়োজনে সেই একই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আর একারণেই গোলাম রাব্বানী তাঁর স্ত্রীকে বিয়ের পরও লেখাপড়া করতে উৎসাহ যোগান ও প্রয়োজনীয় সকল খরচ বহন করেন। বিয়ের সময় অষ্টম শ্রেণী পড়ুয়া গোলাম রাব্বানীর স্ত্রী পরবর্তীতে তাঁর অনুপ্রেরণায় ডিগ্রী পাশ করেন। যেহেতু তাঁর স্ত্রীর পড়াশোনা চলাকালীন সময়ে তাদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়, তাই স্ত্রীর পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে তিনি সন্তানদের দেখাশোনা করতেন। গোলাম রাব্বানী তাঁর তিন সন্তানের মধ্যে কখনো ভেদাভেদ করেননি। প্রত্যেক সন্তানকে তিনি সাধ্যমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর বড় মেয়েকে পাবনার নার্সিং কলেজে পড়াশোনা করিয়েছেন। আর তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সমাপ্ত করেছে। বন্ধুবান্ধবরা মুসলিম হিসেবে মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে যেতে না দেয়ার পরামর্শ দিলেও গোলাম রাব্বানী এসব তথাকথিত ধারণা উপেক্ষা করে স্বপ্ন দেখেন তাঁর মেয়েকে একজন আদর্শ সফল ডাক্তার বানানোর। তিনি বিশ্বাস করেন ইসলাম কখনোই নারী শিক্ষাকে অবহেলা করেনি বরং নারী-পুরুষের সমতাকে সমর্থন করে। মেয়েদের নামমাত্র শিক্ষায় শিক্ষিত না করে তিনি তাদের যোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যাতে তারা নিজের পরিবার ও সমাজের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। নিজে কোরান হাফেজ হবার পরও ধর্মীয় সকল গোঁড়ামি ও সামাজিক প্রভাব উপেক্ষা করে স্ত্রী ও কন্যা সন্তানদের সুশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গোলাম রাব্বানীর এ প্রচেষ্টাই তাঁকে করে তুলেছে ‘প্রিয় বাবা’। হাফেজ গোলাম রাব্বানী মনে করেন,“সমাজের পরিবর্তন হয়েছে। আমরা আইয়ামে জাহিলিয়ায় বসবাস করি না। সে যুগে আমাদের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শিক্ষা গ্রহনের জন্য আরব থেকে সুদুর চীন দেশে যাবার জন্য বলেছেন। এই আধুনিক যুগে আমাদের মেয়েরা প্রয়োজনে সুদুর চীন দেশে যাবে। যদি প্রয়োজন হয় তারা ইউরোপ, আমেরিকা কিংবা পৃথিবীর আরো অন্য যে কোন দেশে যাবে।”

“বৃদ্ধ বয়সে মেয়েরাও প্রিয় বাবাদের জন্য হতে পারে অবলম্বন”

- হাবিবুর রহমান

রংপুর

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পুত্র সন্তান থাকাকে ক্ষমতার এক অন্যতম নিয়ামক হিসেবে গড়ে তোলে। আধিপত্যবাদী পৌরুষের প্রভাবে বাবারা সেইসব চর্চাকে উৎসাহিত করেন, যার ভেতর দিয়ে কন্য সন্তান নানা প্রকার বৈষম্যের শিকার হয়। ছেলে হোক বা মেয়ে হোক সব সন্তানই বাবার কাছে সমান। কিন্তু বাবারা আধিপত্যবাদী পৌরুষের প্রভাবে ধরেই নেন পুত্র সন্তান যা পারবে কন্যা সন্তান কখনোই তা পারবে না। যুগের পর যুগ ধরে এ কারনেই কন্যা শিশুদের মুখোমুখি হতে হয়েছে নানা বৈষম্যের। আধিপত্যবাদী পৌরুষের প্রভাবে পিতৃত্বের এই চর্চা থেকে রংপুরের বকশিগঞ্জ গ্রামের হাবিবুর রহমান পুত্র সন্তানের আশায় একে একে পিতা হন ৮ টি কন্যা সন্তানের। আট কন্যা সন্তানের জন্মের পর প্রতিবেশীরা তাকে নানাভাবে ভয় দেখাতো তাদের শেষ জীবনের পরিণতি নিয়ে। সবাই তাকে দুর্ভাগা ভাবতো এবং পরামর্শ দিতো মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু হাবিবুর রহমান তার বড় মেয়ের পড়ার প্রতি আগ্রহ দেখে এক সময় সিদ্ধান্ত নেন তিনি তার মেয়েদের পড়াশোনা করাবেন। প্রতিবেশীদের কথায় প্রভাবিত না হয়ে একে একে হাবিবুর রহমান তার আট মেয়েকেই পড়াশোনা করান। এইচএসসি পাশ করার পর তার বড় মেয়ে একটি চাকরি পায় এবং পরিবারে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করে। বড় মেয়ের পরামর্শে তিনি বুঝতে পারেন তার অন্যান্য মেয়েদেরকে লেখাপড়া করালে তারাও একই ভাবে নিজেদের পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসেবে তৈরি হতে পারে। এর পর থেকে হাবিবুর রহমানকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। হাবিবুর রহমান মনে করেন, “প্রিয় বাবাদের কন্যা সন্তান পুত্র সন্তানের মধ্যে পার্থক্য করলে হবে না। পুত্র সন্তান যা পারে কন্যা সন্তানও তাই পারে। প্রতিটি কন্যা সন্তান তাই প্রিয় বাবাদের জন্য হতে পারে অবলম্বন। প্রয়োজন শুধু তাকে মানুষ হিসেবে তৈরী হওয়ার সুযোগ দেয়া।”

“শুধু স্ত্রী-মেয়ে নয়, পুত্রবধূদের কাছেও হতে হবে প্রিয় বাবা”

- মোঃ নুরুল ইসলাম

পাবনা

আধিপত্যবাদী পৌরুষ পিতৃত্বের এমন চর্চাকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে, যেগুলো শিক্ষা বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করে। পিতৃত্বের এসকল চর্চার ভেতর দিয়ে পিতৃতন্ত্র পুনরুৎপাদিত হয়। আধিপত্যবাদী পৌরুষ দ্বারা প্রভাবিত পিতৃত্বের এসকল চর্চাগুলো থেকে বের হয়ে কোন কোন পুরুষ, বাবা বা স্বামী হিসেবে নিজ স্ত্রী বা কন্যা সন্তানের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করলেও তা কেবল নিজ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। কিন্তু পাবনার ফরিদপুর জেলার আগপুঙ্গলী গ্রামের নুরুল ইসলাম ইতিবাচক পৌরুষ চর্চার পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে আছেন কেননা, তিনি স্ত্রী-মেয়ের পাশাপাশি নিজ পুত্রবধূ, হোমায়রাকে লেখা-পড়া করিয়েছেন, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিযুক্ত হতে উৎসাহ দিয়েছেন। এমনকি যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি পুত্রবধূকে মোটর বাইকও কিনে দিয়েছেন।

নুরুল ইসলাম নিজে উচ্চমাধ্যমিকের গন্ডি পার হয়েছেন এবং স্ত্রীকেও বিয়ের পর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করতে সমর্থন দেন এবং সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগদান করতে উৎসাহিত করেন।পরবর্তীতে গ্রামে একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে তারা নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর বড় ছেলে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক, ছোট ছেলে ঢাকায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা করছে। একমাত্র মেয়ে সিরাজগঞ্জে পড়াশোনা করছে।

নুরুল ইসলামের বড় ছেলের বউ অন্য ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাই তাঁর ছেলে ও পুত্রবধূ একে অপরকে পছন্দ করা সত্ত্বেও গ্রামের কেউ এই বিয়ে মেনে নিতে রাজি হয়নি। নুরুল ইসলাম সব কিছুকে উপেক্ষা করে গ্রাম থেকে বাইরে গিয়ে সিরাজগঞ্জে তাদের বিয়ের আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। নিজের চরম অস্বচ্ছলতার মাঝে তিনি সাহস দেখিয়েছেন হোমায়রাকে (পূর্বনামঃ শাপলা রাণী) পড়িয়ে। কারণ ছোটবেলা থেকে মেধাবী ছাত্র হোমায়রার স্বপ্ন ছিল, লেখাপড়া করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার জগত থেকে সে মুক্তি পাবে। হোমায়রা বর্তমানে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতার ফলে হোমায়রার প্রথম সন্তান তাঁর গর্ভেই মারা যায়। গর্ভপাতের পর সে শারীরিক ও মানসিক ভাবে যখন প্রচন্ড ভেঙ্গে পরেছিল তখন তাঁকে সাহস দিয়েছেন তাঁর স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্য। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে হোমায়রা। যেই দূর্গম পথের যাত্রার জন্য তাঁর এ অবস্থা, তার অবসান ঘটাতে নুরুল ইসলাম হোমায়রাকে কিনে দেন একটি মোটর বাইক। যার ফলে হোমায়রার কর্মস্থল পর্যন্ত যাওয়ার পথ কিছুটা হলেও সহজ হয়। হোমায়রার মতে, তার জন্য শ্বশুরের কাছ থেকে পাওয়া সহযোগীতা এ এক চমকপ্রদ উপহার। নুরুল ইসলাম মনে করেন, “পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রথাগতভাবে বিয়ের পরে মেয়ের বাসস্থান হয় তাঁর স্বামীর ঘরে। বাবা হিসেবে স্বামীর বাবাকে সে ডাকে বাবা। প্রিয় বাবাদের পুত্রবধূকে নিজের মেয়ের মতই ভাবতে হবে, তাঁর শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে, তাকে সাহায্য করতে হব নিজের পায়ে দাঁড়াবার।”

“প্রিয় বাবাদের সন্তানদের সাথে হতে হবে বন্ধুর মত”

- দিলীপ চন্দ্র দাস
রংপুর

আধিপত্যবাদী পৌরুষের প্রভাবে পিতৃত্বের প্রথাগত চর্চা অনুসরণ করে বাবারা সন্তানদের সাথে এক ধরণের দূরত্ব রাখেন, ধরে নেয়া হয় ‘বাবাকে হতে হবে গম্ভীর যাকে সন্তানরা ভয় পাবে’। তাই এ সমাজে সন্তানরা বাবাদের সাথে মন খুলে কথা বলার সুযোগ পায় খুবই কম। আর এ পরিস্থিতিতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে বাবাদের সাথে সন্তানদের মন খুলে আলোচনার পরিবেশ চিন্তা করা অসম্ভবই বলা চলে। রংপুর জেলার সদর উপজেলার দিলীপ চন্দ্র দাস প্রায় ২২ বছর বিভিন্ন এনজিও কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিশেষত বয়ঃসন্ধিকালের স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে কাজ করেন। তিনি তার স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে বয়ঃসন্ধিকালের বিভিন্ন পরিবর্তন এবং তাদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। দিলীপ চন্দ্র তার দীর্ঘ দিনের কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার সন্তানদের জন্য পরিবেশ তৈরীর চেষ্ঠা করছেন। তার এক ছেলে, এক মেয়ে যাদের প্রত্যেককেই তিনি বয়ঃসন্ধিকালে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে খোলামেলা আলোচনার চেষ্টা করেছেন। বয়ঃসন্ধিকালে সন্তানদের পাশে বন্ধুর মত দাঁড়িয়েছেন। তার সন্তানদের কাছে বাবা যতটা না ভয়ের, তারচেয়ে অনেক বেশী ভালবাসার পাত্র। দিলীপ দাস মনে করেন, বাবা যখন বন্ধুর মত সন্তানদের পাশে দাঁড়ায় তখনই সে প্রিয় বাবা হয়ে উঠে। আর বাবা যদি প্রিয় বাবা হন, সন্তানদের মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠার সুযোগ অনেক বেড়ে যায়। দিলীপ মনে করেন, বয়সন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের সময় ছেলে মেয়েরা যে ভুল তথ্য পায় তাই তাদের আগ্রহী করে তোলে ভুল পথে পা বাড়ানোর দিকে। অথচ বাবারা যদি প্রিয় বাবা হয়ে উঠেন, তবে এইরকমটি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। দিলীপ দাস মনে করেন যে, বাংলাদেশে প্রত্যেক দম্পতিরই সর্বোচ্চ দুটি সন্তান নেওয়া উচিত। জন্ম বিরতিকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। তার মতে “শুধু নারীরাই কেন জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতির ব্যবহার করবে। পুরুষদেরও এগিয়ে আসা উচিত”। দিলীপ চন্দ্র তার এ বিশ্বাস থেকে নিজেও দীর্ঘস্থায়ী জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

“পুত্র সন্তান হোক আর কন্যা সন্তানই হোক, প্রিয় বাবাদের সকল সন্তানকেই করে তুলতে হবে সুশিক্ষিত”

- মোঃ সেলিম উদ্দিন

কক্সবাজার

আধিপত্যবাদী পৌরুষ পিতৃত্বের চর্চায় ছেলে সন্তানের শিক্ষাকেই করে তোলে বাবাদের অন্যতম দায়িত্ব। কন্যা সন্তান এক্ষেত্রে থাকে উপেক্ষিত। ডেইল পাড়ার মেয়েদের কঠিন পর্দা এবং ধর্মীয় অনুশাসনের কঠোর বেড়াজালের মধ্যে থেকেও মোঃ সেলিম উদ্দিন তাঁর তিনজন ছেলে সন্তান ও তিনজন কন্যা সন্তানসহ নিজের ছয় সন্তানকেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন, যেখানে তার গ্রামে প্রাইমারি স্কুল পাশ করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়। ভাইবোনদের মধ্যে সবার ছোট সেলিমের বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। সেলিমের অনুপ্রেরণা ছিলেন তাঁর স্কুল শিক্ষক বড় মামা এবং তাঁর প্রাইমারি শেষ করা মা। তাদের অনুপ্রেরণাতেই তিনি এইচ এস সি শেষ করেন এবং ডিগ্রিতে ভর্তি হন কিন্তু মায়ের মৃত্যু পর তিনি ডিগ্রি পরীক্ষা দিতে পারেন নি।

কর্মজীবনের শুরুতে বিজিবিতে চাকরি হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজি না জানার কারণে তাঁকে চাকরিটা ছেড়ে জীবনের তাগিদে ব্যবসা শুরু করতে হয়। এই ঘটনা তাঁকে তাঁর ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আরও উদ্বুদ্ধ করে। সেলিমের যথেষ্ট আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাঁর অষ্টম শ্রেণী পাশ স্ত্রী কখনও বাইরে কাজ করতে চান নি। কিন্তু সেলিম তাঁর কোনও মেয়েকেই চাকরি জীবনে প্রবেশের আগে বিয়ে দেননি। মোঃ সেলিমের বড় মেয়ে পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষকতা করছেন ডেইলপাড়ারই একটি প্রাইমারি স্কুলে। বড় ছেলে চাকুরিরত আছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে। মেজো মেয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষানবিষ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামি ব্যাংকএ। তার ছোট ছেলে ও মেয়ে পড়াশোনা করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সেলিম তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বাবা মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক এবং মেয়েদের পড়াশোনা ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবার গুরুত্ব অনুধাবন করেন যা তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে সঠিকভাবে বড় করে তুলতে কাজে লাগান। সন্তান লালনপালন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সেলিম তাঁর স্ত্রীকে সবসময় সবরকম সাহায্য করেছেন। মোঃ সেলিমের এসব অবদানের কারণেই তাঁর তিন মেয়েসহ ছয় ছেলেমেয়েই আজ স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। মোঃ সেলিম মনে করেন, “পুত্র সন্তানই হোক আর কন্যা সন্তানই হোক, প্রিয় বাবাদের সকল সন্তানকেই করে তুলতে হবে সুশিক্ষিত। সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল বাধা অতিক্রম করতেই হবে প্রিয় বাবাদের।”

“প্রিয় বাবাদের ঘরের কাজে অংশ নিতে হবে, অংশ নিতে হবে সন্তান লালন পালনে”

- মোঃ নাসির

কক্সবাজার

সাধারণত মনে করা হয়, গৃহস্থালী কাজ কখনোই পুরুষের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না এবং ঘরের কাজে নিযুক্ত হলে পৌরুষ ক্ষুণ্ন হবে। কখনো কখনো পুরুষ স্ত্রীকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে ঘরের কাজে অংশ নিয়ে থাকেন। এমন উদাহরণ খুব কমই আছে যেখানে পুরুষরা ঘরের কাজে নারীর সমান কাজই করছেন। কক্সবাজারের বড়ছড়া গ্রামের মোঃ নাসির সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব এবং অন্যান্য গৃহস্থালী কাজ শুধু স্ত্রীর উপর ছেড়ে না দিয়ে সমানভাবে নিজেও সেই দায়িত্ব পালন করেছেন।

ধর্মীয় রক্ষণশীল এলাকায় বড় হয়েও প্রণয়ের পর বিয়ে করাটা নাসিরের জীবনের উলেখযোগ্য একটি ঘটনা। তাঁর বাবা মায়ের মধ্যকার ইতিবাচক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যেও একটি সুন্দর ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে সাহায্য করে। প্রচলিত প্রথা ভেঙ্গে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন তাঁর যত্ন নেয়ার পাশাপাশি বাড়ির অধিকাংশ কাজই তিনি নিজেই করেন এবং স্ত্রীকে নিয়মিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে এক অনন্য নজির স্থাপন করেন। তিনি বলেন, “আমার স্ত্রী যখন গর্ভাবস্থায় ছিল সেসময়ে সার্বক্ষণিক স্ত্রীর যত্ন নিয়েছি, ভারী কোন কাজ করতে দিতাম না, কাপড় ধোয়া, উঠান ঝাড়ু দেয়া, ঘর লেপা, পানি আনার কাজগুলো নিজেই করতাম”। একে একে আট সন্তানের বাবা-মা হবার পর পরিবারে তাঁর স্ত্রীর কাজকর্ম বৃদ্ধি পায়। একার পক্ষে সংসারের সকল কাজ করে সন্তানের যথাযথ দেখাশোনা করা তার স্ত্রীর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সন্তান জন্মের পরও তাদের সকল ধরনের যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রেও তিনি স্ত্রীর সাথে সমস্ত দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেন। তিনি মনে করেন সন্তানের প্রতি তাদের উভয়েরই সমান দায়-দায়িত্ব রয়েছে। তাঁর মতে, “আমার স্ত্রী আমার অর্ধাঙ্গিনী। পরিবারে তাঁর যেমন দায়িত্ব রয়েছে, আমার নিজেরও তেমন দায়িত্ব রয়েছে। সন্তান আমার স্ত্রীর একার না, আমারও। তাই স্ত্রীর সাথে আমি আমার সন্তানদের লালন পালনের দায়িত্ব নিয়েছি। প্রকৃত বাবা হতে হলে ঘরের কাজে অংশ নিতে হবে, অংশ নিতে হবে সন্তান লালন-পালনে”। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করলেও মোঃ নাসির লেখাপড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে ছিলেন সচেতন। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও তাঁর আট ছেলেমেয়েকে পড়াশোনা করিয়েছেন, যেখানে তাঁর গ্রামের শুধু মেয়েরাই না, অধিকাংশ ছেলেরাও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। মোঃ নাসিরের বড় ছেলে হাফেজী মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন। তিনি বর্তমানে মালয়েশিয়াতে কর্মরত রয়েছেন। দ্বিতীয় ছেলে কক্সবাজার হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশানাল কলেজে, তৃতীয় ছেলে চট্টগ্রাম সিটি কলেজে ও চতুর্থ ছেলে কিন্টারগার্ডেন স্কুলে পড়ছে। কক্সবাজারের মত জায়গায় যেখানে মেয়েদের লেখাপড়া বলতে শুধুমাত্র আরবী শিক্ষাকে বোঝানো হয়, সেখানে মোঃ নাসির তাঁর চার মেয়েকেই লেখাপড়া করাচ্ছেন ও এখনো বিয়ে দেন নি। তিনি বলেন, “ছেলেরা যেমন আমার সন্তান তেমনি মেয়েরাও আমারই সন্তান। আলাহ আমাকে যখন সামর্থ দিয়েছেন, সে অনুযায়ী আমার সব সন্তানদের সমান ভাবে লেখাপড়ার সুযোগ দেয়া আমার দায়িত্ব। আলাহ বলেন, তিন কন্যা সন্তানকে ভালভাবে মানুষ করলে সেই বাবা জান্নাতবাসী। আমি আলাহর রাস্তায়ই চলছি”। মোঃ নাসিরের প্রথম ও তৃতীয় মেয়ে চট্টগ্রাম সিটি কলেজে পড়ছে। দ্বিতীয় মেয়ে কক্সবাজার হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশানাল কলেজে ও ছোট মেয়ে পড়ছে কিন্টারগার্ডেন স্কুলে। তাই তিনি বাবা হিসেবে সন্তানদের কাছেই প্রিয় নন, বরং সমাজের কাছেও আদর্শ।

“বিয়ের পরও প্রয়োজনে প্রিয় বাবাদের নিতে হবে সন্তানের পড়ালেখার দায়িত্ব”

- মোঃ দেলোয়ার হোসেন

রংপুর

সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বাবারা নিজেদেরকে স্বতন্ত্র অবস্থানে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। এর ফলে অধিকাংশ বাবাই পিতৃত্বের এমন কিছু বিশ্বাস, প্রথা এবং চর্চায় জড়িয়ে যান যা পিতৃতন্ত্রকে পুনরুৎপাদন করে। ফলে অধিকাংশ সময় সন্তানের সাথে বাবার সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত হয়। দেলোয়ার হোসেন এই শেকল ভেঙ্গে তাঁর পরিবারের মধ্যে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি করেছেন। শুধু নিজের পরিবারে থাকা অবস্থাতেই নয়, বরং মেয়ের বিয়ের পরও মেয়ের প্রতি ভালোবাসা থেকে মেয়ের লেখাপড়ার খরচ তিনিই বহন করছেন। নারীশিক্ষা এখনও বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলেই অর্থের অপচয় বলে মনে করা হয়। বিশেষ করে স্বল্প আয়ের পরিবারে এই ধারণাটি সবার মনে গেঁড়ে বসেছে। গ্রামীণ সমাজ স্বভাবতই মনে করে, ছোট্ট একটি ব্যবসা দিয়ে আর যাই হোক মেয়েদেরকে লেখাপড়া করিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। যারা বিয়ের পর অন্য সংসারে চলে যাবে তাঁদের জন্য অর্থ ব্যয় করা বোকা-ম। গ্রামীণ সমাজের গতানুগতিক এ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে দেলোয়ার হোসেন তাঁর চার মেয়েকে পড়াশুনা করাচ্ছেন। যেখানে শিক্ষা, বিশেষকরে উচ্চ শিক্ষা শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য প্রয়োজন মনে করা হয় এবং মেয়েদের জন্য তা বিলাসিতা বলে ধরা হয় সেখানে দেলোয়ার হোসেন মনে করেন, ”যদিও মনে করা হয় মেয়েরা জীবনের একটা সময়ে বাবার বাড়ি থেকে চলে যাবে, তারপরও মেয়েদের শিক্ষা মোটেও অবহেলা করার মত নয়।” দেলোয়ার হোসেন তাঁর মেয়েদের শুধুমাত্র লেখাপড়া করাতে চান, তা নয়। তিনি চান তাঁর মেয়েরা যেন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজে বড় বড় জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং মা-বাবার দেখাশোনা করতে পারে। তাঁর বড় মেয়ে লেখাপড়া চলাকালীন সময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তাই বলে দেলোয়ার হোসেন মেয়ের প্রতি নিজের দায়িত্ব শেষ বলে মনে করেননি। বরং আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিবাহিত মেয়ের লেখাপড়ার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, “বিয়ের পরও প্রয়োজনে প্রিয় বাবাদের নিতে হবে সন্তানের পড়ালেখার দায়িত্ব”। যৌতুক প্রথা এখনও বাংলাদেশের গ্রাম এবং শহর উভয় জায়গাতেই একটি ব্যাধি। দেলোয়ার হোসেন এই প্রথার বিরোধিতা করেন এবং তিনি তাঁর মেয়েদের বিয়েতে যৌতুক দেননি তবে মেয়ের পড়ালেখার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং অন্য মেয়েদের বিয়েতে যৌতুক দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি চান তার মেয়েরা পড়ালেখা শেষ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হোক যেন তারা নিজেদের পরিবারের খরচ নিজেরাই বহন করতে পারে।

প্রিয়বাবাদের নিজের স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধুসহ সকল নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে”

- বাছের মোল্লা

রংপুর

ইতিবাচক পৌরুষের সবসময়ই বাবাদের পিতৃত্বের সেইসব চর্চাকে উৎসাহিত করে যেগুলো নারী-পুরুষের অসমতা নির্মূলে রাখে অসামান্য ভুমিকা। এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাবনার কুমারপাড়া গ্রামের বাছের মোল্লা। ছোটবেলা থেকেই তার জীবন পরিচালিত হয়েছে বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ৬ মাস বয়সে নিজ বাবাকে হারিয়ে বড় হয়েছেন সৎ বাবার সংসারে যেখানে তার ১ ভাই ও ৫ বোনের সাথে তিনি বড় হয়ে ওঠেন । সৎবাবার সংসারে বৈষম্যের কারণেই তাকে তার সৎ ভাইয়ের সাথে স্কুলে পড়াশুনা করার সুযোগ দেয়া হয়নি। বরং তিনি তার শৈশব এবং যৌবন কেটেছে ফসলের মাঠে কাজ করে । তাই পড়াশুনা না করতে পারাটা তার জীবনের বড় একটা আক্ষেপ । তিনি যেমন শিক্ষানুরাগী তেমনি অক্লান্ত পরিশ্রমী। তার সৎ বাবা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিলেন কিন্তু শ্রমবিমুখতা তাকে ঠেলে দেয় দারিদ্রের দুয়ারে। বাসের মোল্লা এ থেকে শিক্ষা নেন এবং জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে করে নিজের তিন ছেলে ও এক মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। তার বড় ছেলে বর্তমানে পড়াশনা শেষ করে কর্মরত আছেন কুমারপাড়া মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক হিসেবে । মেজো ছেলে কর্মরত আছেন বাংলাদেশ পুলিশে এবং ছোটছেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। তার ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে তিনি কোনো ভেদাভেদ করেননি । শিক্ষিত না হওয়ায় তার স্ত্রীকে ১৩ বছর বয়সে বিয়ে দেয়া হয়, বাছের মোল্লা মনে করেন তাই তাদের প্রথম সন্তান মাতৃগর্ভেই মারা যায়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে করেই হোক নিজের মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় পাশের পর মেয়েকে তার নিজের পছন্দের পাত্রের সাথে বিয়ে দেন। বাছের মোল্লা এবং তার স্ত্রী শিক্ষিত না হওয়ায় সন্তানদের পড়াশুনা করাতে অনেক সমস্যার সম্মুখিন হন। বাছের মোল্লা তাই চান তার তিন ছেলের স্ত্রীই শিক্ষিত হোক। তাই তিনি তার পুত্রবধূকেও বিয়ের পর পড়াশুনা করান এবং চাকুরী করার সুযোগ দেন। বর্তমানে তার বড় ছেলের বউ কুমারপাড়া গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। স্কুলে থাকাকালীন সময়ে তিনি তার পুত্রবধুকে সন্তানকে ডে’কেয়ার সেন্টারে রাখার অনুমতি দেন। বাছের মোল্লা যেমন সংগ্রামী ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন তেমনি নারীদের প্রতি তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। বাসের মোল্লা মনে করেন, ’প্রিয় বাবাদের নিজের স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধুসহ সকল নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন নারীকেই শুধু সম্মানিত করে না বরং পুরুষকেও করে ক্ষমতাবান।”